কোন পথে নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচন

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (০৫ অক্টোবর ২০১১)

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের এখনও প্রায় দুই বছর বাকী। এরই মধ্যে নির্বাচনী হাওয়া যেন প্রবল বেগে বইতে এবং পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে শুরু করেছে। সরকার ও বিরোধী দল নির্বাচন নিয়ে (আপাত দৃষ্টিতে) এক অমীমাংসেয় বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা এ বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অব্যাহত এবং কার্যকর করতে হলে এ বিতর্কের অবসান হওয়া জরুরি।

গণতন্ত্র বাংলাদেশ সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর অংশ। তাই গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা ছাড়া আমাদের কোনো বিকল্প নেই। আর গণতান্ত্রিক যাত্রাপথের সূচনা হয় বা গণতান্ত্রিক উত্তোরণ ঘটে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের মাধ্যমে। তবে নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে যদি দুর্নীতিবাজ ও দুর্বৃত্তরাই নির্বাচিত হয়ে আসে তাহলে সবই হবে পণ্ডশ্রম। ফলে আমাদেরকে শুধু নিরপেক্ষই নয়, অর্থবহ নির্বাচনও নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু সেটি কোন পথে?

আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অর্থবহ নির্বাচনের জন্য প্রয়োজন: (১) একটি যথাযথ আইনি কাঠামো; (২) একটি নির্ভরযোগ্য ভোটার তালিকা; (৩) একটি স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর নির্বাচন কমিশন; (৪) পক্ষপাতহীন প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী; (৫) রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের সদাচারণ; এবং (৬) ব্যাপক জনসচেতনতা ও জনগণের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন।

আইনি কাঠামো: গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে রাজনৈতিক দল, নাগরিক সমাজ ও জেষ্ঠ সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন একটি যুগোপযোগি আইনি কাঠামো প্রণয়ন করে। কাঠামোটির মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার, রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধন, প্রার্থীদের হলফনামার মাধ্যমে তথ্য প্রদান ইত্যাদির বিধান করা হয়। একইসঙ্গে নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণ করা হয়। এ সকল সংস্কারের ফলে ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৮ তারিখে একটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা সম্ভবপর হয়।

ভোটার তালিকা: নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটার তালিকা নিয়ে একটি গুরুতর সমস্যা দেখা দেয়। অভিযোগ ওঠে যে, ভোটার তালিকায় প্রায় সোয়া কোটি ভুয়া ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্ত ছিল। বিষয়টি উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। সমস্যাটি সমাধানের জন্য শেষ পর্যন্ত গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একটি ছবিযুক্ত ও বহুলাংশে নির্ভুল ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হয় (জাতীয় পরিচয়পত্র হিসেবে পরিচিত), যা কমিশন এখন ক্রমাগতভাবে হালনাগাদ করছে। ছবিযুক্ত নতুন ভোটার তালিকাও নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও অবাধ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

নির্বাচন কমিশন: সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য একটি স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশন প্রয়োজন। আর স্বাধীন, শক্তিশালী ও কার্যকর নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন: (ক) যথাযথ ব্যক্তিদের কমিশনে নিয়োগ প্রদান, (খ) নির্বাচন কমিশনের প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বাধীনতা, এবং (ঙ) রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের কমিশনের ক্ষমতা ও নির্বাচনী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা।

নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ নিয়ে আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত তিক্ত। কমিশনারদের পক্ষপাতিত্ব অনেক সময়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে পর্বতপ্রমাণ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার আগেই তাদের অনেককে পদত্যাগ করতে হয়েছে। তবে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নিয়োগপ্রাপ্ত বর্তমান নির্বাচন কমিশনের সদস্যগণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে তাদের দায়িত্ব পালন করে আসছেন, যা নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বর্তমান কমিশনের মেয়াদ ২০১২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। পরবর্তীতে যাতে সৎ, যোগ্য ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা কমিশনে নিয়োগপ্রাপ্ত হন সে লক্ষ্যে বর্তমান কমিশন সম্প্রতি *প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার (নিয়োগ পদ্ধতি) আইনে*'র একটি খসড়া প্রস্তাব করেছে। বলাবাহুল্য যে, আমাদের সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদে এমনি একটি আইন প্রণয়নের নির্দেশনা দেওয়া আছে। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে এব্যাপারে তেমন আগ্রহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। ফলে ভবিষ্যতে নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে আবারও বড় ধরনের বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে, যা আগামী নির্বাচনকেই অনিশ্চিত করে তুলতে পারে।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে শোনা যাচ্ছে যে, সরকার আরও দুইজন নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ প্রদান করবে। এব্যাপারে বিরোধী দলের সঙ্গে কোনো ধরনের আলাপ-আলোচনা শুরু হয়েছে বলে আমরা শুনিনি। তাই গণমাধ্যমের প্রতিবেদন সত্য হলে, অতীতের সরকারের ন্যায় বর্তমান সরকারও একতরফাভাবে নতুন কমিশনার নিয়োগ প্রদান করবে, যা আরও জটিলতার সৃষ্টি করতে পারে।

অতীতে নির্বাচন কমিশন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে পর্বতপ্রমাণ বাধা হিসেবে কাজ করেছে। তবে বর্তমান কমিশনের মেয়াদকালে একটি আইনের মাধ্যমে কমিশনের সচিবালয়কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে বিযুক্ত করা হয়। কিন্তু আইনগতভাবে কমিশনের সচিবালয় স্বাধীনতা অর্জন করলেও কমিশনের আর্থিক স্বাধীনতা এখনও পুরোপুরি নিশ্চিত হয়নি। আর্থিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হলে কমিশনের ব্যয়কে সংবিধানের ৮৮ অনুচ্ছেদের অধীনে সংযুক্ত তহবিলে দায়যুক্ত ব্যয় হিসেবে ঘোষণা করতে হবে।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, নির্বাচনের পর নবম জাতীয় সংসদ *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২ সংশোধনের লক্ষ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারি করা অধ্যাদেশটি অনুমোদন করলেও, এর থেকে না-ভোটের বিধানটি বাদ দেওয়া হয়। এছাড়াও সংশোধিত আইনে রাজনৈতিক দলের তৃণমূলের কমিটিসমূহের তৈরি *প্যানেলের ভিত্তেতে* মনোনয়ন প্রদানের বাধ্যবাধকতা রহিত করে ওই *প্যানেল শুধুমাত্র বিবেচনায় নেওয়ার* বিধান করা

হয়, যা ছিল সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত। এমনি প্রেক্ষাপটে সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন আইনি কাঠামোতে আরও কিছু পরিবর্তনের প্রস্তাব নিয়ে স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময়ের উদ্যোগ নেয়। এ উদ্যোগে বিএনপি সাড়া দেয়নি। আওয়ামী লীগ সাড়া দিলেও কোনো মতামত দেয়নি। তাই নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত সংস্কারগুলোর ভবিষ্যত নিয়ে গুরুতর অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে, যা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে ভবিষ্যতে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

কমিশনের ক্ষমতা ও নির্বাচনী আইনের প্রতি অবজ্ঞা: ভবিষ্যতের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে আরেকটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের কমিশনের ক্ষমতা ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার অভাব। স্মরণ করা যেতে পারে যে, *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ*, ১৯৭২-এর সংশোধনের লক্ষ্যে গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারি করা অধ্যাদেশে নির্বাচন কমিশনের অধীনে রাজনৈতিক দলের বাধ্যতামূলক নিবন্ধনের বেশ কয়েকটি শর্ত আরোপ করা হয়। দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা, দলের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের বিলুপ্তি, দলের বিদেশী শাখার বিলুপ্তি, দলের তৃণমূলের সদস্যদের তৈরি প্যানেলের ভিত্তিতে সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদান ইত্যাদি এ সকল শর্তের অংশ। আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো প্রথম তিনটি শর্ত পুরোপুরি উপেক্ষা করে আসছে। দলের পক্ষ থেকে অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন বিলুপ্তির প্রশ্নে নির্বাচন কমিশন আপত্তি তুললে, কমিশনকে প্রধান দলসমূহের রক্তচক্ষুর সম্মুখীন হতে হয়। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও বিএনপি ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল সম্পর্কিত বিধান তাদের গঠনতন্ত্র থেকে বাদ দিলেও, কারো মনে সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, এগুলো তাদের অঙ্গ সংগঠন হিসেবেই ভূমিকা পালন করছে।

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় দলের তৃণমূলের কমিটির তৈরি প্যানেলের ভিত্তিতে সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদানের বিধানটি বিএনপি, জাতীয় পার্টি ও জামায়াতে ইসলামী সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে, যে ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন কিছুই করতে পারেনি। আওয়ামী লীগ মতামত নিলেও তা পুরোপুরি মেনে মনোনয়ন প্রদান করেনি। আরও হতাশাব্যঞ্জক হলো যে, মহাজোট সরকার, পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, আইনপ্রণয়নের ক্ষমতা ব্যবহার করে দলের তৃণমূলের সদস্যদের এ ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছে। আইনের প্রতি এ ধরনের বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন ও দলের সদস্যদের প্রতি এমন দায়বদ্ধতাহীনতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য কোনোভাবেই ইতিবাচক নয়।

আরেকটি ক্ষেত্রেও আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনাকে উপেক্ষা করে আসছে। বহুদিন থেকেই নির্বাচন কমিশন বলে আসছে যে, স্থানীয় সরকার নির্বাচনগুলো নির্দলীয়। বস্তুত, নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী, স্থানীয় নির্বাচনে দলের প্রতীক ও দলীয় নেতৃবৃন্দের ছবি ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবুও আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন দিয়ে আসছে। এমন অন্যায়, অনৈতিক ও বেআইনি আচরণের সর্বশেষ দৃষ্টান্ত হলো, নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনে মেয়র পদপ্রার্থীদের দলীয় মনোনয়ন প্রদানের অপচেষ্টা। অর্থাৎ বহুদিন থেকেই আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতাকে উপেক্ষা করে আসছে, যার বিরুদ্ধে কমিশন কোনো ব্যবস্থাই নিতে পারেনি এবং ভবিষ্যতের কমিশন এ ব্যাপারে কোনো সফলতা লাভ করতে পারবে বলে আশা করা যৌক্তিক বলে আমাদের মনে হয় না।

প্রসঙ্গত, আগামী ৩০ অক্টোবর নারায়নগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচন। আচরণবিধি লঙ্ঘন করে দলগুলো যে দলীয় মনোনয়ন প্রদান করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে আমরা নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ আশা করি। এছাড়াও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নারায়নগঞ্জে একটি উত্তপ্ত পরিস্থিতি বিরাজ করছে। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মেয়র পদপ্রার্থীর পক্ষ থেকে অবিলম্বে সেনাবাহিনী মোতায়েনের দাবি উঠেছে। প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও তারা তুলছেন। গত ৩ অক্টোবর আমরা 'সুজনে'র পক্ষ থেকে নারায়নগঞ্জ প্রেসক্লাবে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলাম। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রায় সকল সাংবাদিকই সমস্বরে একই দাবি উত্থাপন করেছেন। তাই অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের স্বার্থে আমরা নির্বাচন কমিশনকে এ দাবিগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নেওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি।

নিরপেক্ষ প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী: নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথে আরেকটি বড় হুমকি প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দলীয়করণ। দীর্ঘদিন ধরে দলীয়করণের অপসংস্কৃতি আমাদের দেশে চলে আসছে। কিন্তু গত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে দলতন্ত্র ও ফায়দাতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রতিটি রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তার লাভ করেছে। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সরকারের আমলে তা অব্যাহত রয়েছে। একটি জাতীয় নির্বাচনে দশ লক্ষাধিক সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যের সরাসরি সম্পৃক্ততা প্রয়োজন। এসব ব্যক্তিদের অধিকাংশ যদি দলবাজিতে লিপ্ত থাকে, ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে ফায়দা লাভ করে এবং ক্ষমতাসীন দলকে নির্বাচনে জয়ী করতে বদ্ধপরিকর হয়, তাহলে সর্বাধিক স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও এককভাবে নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা সম্ভবপর নয়।

অতীতে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিদায়ী দলীয় সরকারের রেখে যাওয়া প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে দলীয় অনুগতদের নিয়ে সৃষ্ট 'সাজানো বাগান' ভেঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পদে অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষদের নিয়োগ দিতো। একইসাথে তত্ত্বাবধায়ক সরকার একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতো, যাতে সকল কর্মকর্তা নিরপেক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে পারে। গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ ধরনের নিরপেক্ষ ভূমিকার কারণেই নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয়েছিলো।

তবে গত জুন মাসে সংসদে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের পর অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে গিয়েছে। সংশোধনীটি পাশের মাধ্যমে উচ্চ আদালতের দোহাই দিয়ে, যদিও আদালত এখনও পূর্ণ রায় প্রকাশই করেনি, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। এছাড়া আদালত তার 'সংক্ষিপ্ত আদেশে' তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে ভবিষ্যতের জন্য বেআইনি (prospectvely void) বলে ঘোষণা দিয়েছেন এবং রাষ্ট্র ও জনগণের নিরাপত্তার খাতিরে এটিকে আরও দুই টার্ম রাখার পক্ষে পর্যবেক্ষণ প্রদান করেছেন। ফলে আগামী নির্বাচন দলীয় সরকারের অধীনেই অনুষ্ঠিত হবে, যা তাদের ক্ষমতায় অব্যাহত থাকা বহুলাংশে নিশ্চিত করবে। দলবাজিতে লিপ্ত ও সরকারের ফায়দাপুষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারিরা নিজেদের স্বার্থে স্বপ্রণোদিত হয়েই তা ঘটাবে, এর জন্য ক্ষমতাসীনদের চোখের ইশারারও প্রয়োজন পড়বে না। অর্থাৎ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে

দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা বদলের পথই বহুলাংশে রুদ্ধ হয়ে যাবে, যা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে চরম হুমকির মধ্যে ফেলে দেবে বলে আমাদের আশঙ্কা।

সম্প্রতি তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিতর্ক নতুন মার্গে পৌঁছেছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি একাধিকবার – একবার নিউইয়র্কে আরেকবার বাংলাদেশে – অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়াই নির্বাচন হবে এবং সবাই এতে অংশগ্রহণ করবে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকসহ দল ও সরকারের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন। পক্ষান্তরে মাননীয় বিরোধী দলীয় নেত্রী গত ২৭ সেপ্টেম্বরের সমাবেশ থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া নির্বাচনে না যাওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন। এমন সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের প্রেক্ষিতে অনেক সংবাদপত্র নির্বাচন 'হবে, হবে, হবে – হবে না, হবে না, হবে না' শিরোনাম করেছে।

এটি সুস্পষ্ট যে, সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী পাশের ফলে আওয়ামী লীগের অধীনেই আগামী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, যা বিএনপিসহ অন্যান্য বিরোধী দলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তেমনিভাবে নির্বাচন যদি বিএনপির অধীনে হয়, তাহলে তা আওয়ামী লীগ ও তার মিত্রদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই জাতি হিসেবে আমরা একটি অচলাবস্থার মধ্যে নিপতিত হয়েছি। ফলে আগামী নির্বাচন হয় একতরফা, না হয় বিতর্কিত হবে। এমনকি নির্বাচন না হওয়ার সম্ভাবনাকেও একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এমতাবস্থায় আমরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হতে পারি, যা অগণতান্ত্রিক শক্তির ক্ষমতা দখলের পথ প্রশস্ত করতে পারে।

প্রসঙ্গত, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাশের সময় এবং সম্প্রতিকালেও ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনকে শক্তিশালী করার এবং কমিশনকে নির্বাচনকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার যেসব দায়িত্ব পালন করে সেগুলো কমিশনকে প্রদানের কথা বলা হয়েছে এবং হচ্ছে। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব রাষ্ট্রপতি ও সংসদসদস্যদের নির্বাচনের জন্য ভোটারতালিকা প্রণয়ন, রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচন অনুষ্ঠান, সংসদসদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ। নির্বাচনকালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব মূলত আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ এবং প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহায়তা করা, যা কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত নয়। এছাড়াও একটি জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান একটি বিশাল কর্মযজ্ঞ এবং এ কর্মযজ্ঞ পালনের পাশাপাশি, দলীয় সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা কমিশনের পক্ষে সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি না। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের ব্যর্থতা আমাদের সংকটকে আরও ঘণীভূত করবে।

তাই আমরা মনে করি যে, নির্বাচনকে বিতর্কের বাইরে রেখে আমাদের গণতান্ত্রিক যাত্রাপথকে অব্যাহত রাখতে হলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সংবিধানে অন্তত আগামী দুই টার্মের জন্য পুনঃসংযোজন করার কোনো বিকল্প নেই। তবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে দুটি আপত্তি রয়েছে – একটি আদালতের এবং আরেকটি ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে। আদালত বিচারবিভাগকে এ ব্যবস্থার বাইরে রাখার পক্ষে। সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুই বছরের মেয়াদকালে রাজনীতিবিদদের যেভাবে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি ক্ষমতাসীনরা দেখতে চায় না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার সংস্কারের মাধ্যমে এ দু'টি সমস্যারই সমাধান করা সম্ভব। প্রথমত, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে সর্বশেষ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হওয়ার বিধান বাতিল করে আপিল বিভাগ থেকে অবসরপ্রাপ্ত সকল বিচারপতির সমন্বয়ে একটি প্যানেল গঠন করা যেতে পারে, যে প্যানেলের সভাপতিত্ব করবেন সবার আগে অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। এই প্যানেল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্য থেকে কিংবা যেকোনো একজন সম্মানিত নাগরিককে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হিসেবে নিয়োগ প্রদানের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করবেন এবং রাষ্ট্রপতি সে অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান করবেন। প্রধান উপদেষ্টা অন্যান্য উপদেষ্টাকে নিয়োগ দেবেন। আর সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ৯০ দিন পর তত্ত্বাবধায়ক সরকার স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল এবং আগের সরকার ও সংসদ পুনরুজ্জীবিত এবং তারা সবার সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সমস্যার একটি সমাধান বের করার বিধান করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে সংসদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আমাদের অনেক সংসদসদস্য বর্তমানে নগ্নভাবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিভিন্ন অপকর্ম ও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধিতে লিপ্ত। এসব সংসদসদস্যদের ক্ষমতায় থাকাকালীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে তারা নির্বাচনকেও প্রভাবিত করতে পারে। তাই সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে অন্তর্ভুক্ত সংসদের মেয়াদ উত্তীর্নের আগে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধানও সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পথে আরেকটি বড় বাধা।

রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থী: রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীদের ওপরই বহুলাংশে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নির্ভর করে। কারণ রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীরাই সকল নির্বাচনী অপরাধের উৎস। তারাই মনোনয়ন বাণিজ্যে লিপ্ত হয়, নির্বাচনে টাকা দিয়ে ভোট কেনে, নির্বাচনে পেশী শক্তির ব্যবহার করে, প্রতিপক্ষকে হুমকি দেয়, ভোটারদেরকে ভোটকেন্দ্রে অসতে বিরত করে, ভোটকেন্দ্রে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজনৈতিক দলগুলোই নির্বাচনকে টাকার খেলায় পরিণত করে, যা আমাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য আজ বিরাট প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই রাজনৈতিক দলগুলোর এবং তাদের প্রার্থীদের সদাচারণ ব্যতীত সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠান কোনোভাবই সম্ভব নয়। বস্তুত দল ও প্রার্থীর সদাচারণ নিশ্চিত হলে নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথের অনেক বাধাই দূর হয়ে যাবে। আর এজন্য প্রয়োজন হবে রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে গণতন্ত্রের চর্চা ও শুদ্ধি অভিযান। কিন্তু রাজনৈতিক দলের সংস্কারের ব্যাপারে কোনো আলোচনাই আজ কোনো স্তরে নেই এবং রাজনৈতিক দলগুলোও এব্যপারে সম্পূর্ণ অনাগ্রহী। ফলে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পথে এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা দূর করার কোনো সম্ভাবনাই আমরা দেখতে পাই না।

ভোটার সচেতনতা ও তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়ন: নির্বাচনে ভোটাররাই ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন করে। তাই ভোটারদের সচেতনতা এবং তাদের প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্যপ্রাপ্তি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। বস্তুত ভারতীয় সুপ্রিম কোর্টের এক ঐতিহাসিক রায়ে বলা হয়েছে: "একথা সত্য যে, রাজনৈতিক দলগুলোই নির্বাচনী যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তবে নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হবে যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে ভোটাররা না জানে। তাদের 'এ' কিংবা 'বি'-এর পক্ষে ভোট দেওয়ার কোনো ভিত্তি থাকবে না। এই ধরণের নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না, নিরপেক্ষও না" [*পিইউসিএল বনাম ইউনিয়ন অব ইন্ডিয়া* (২০০৩) ৪ এসসিসি]। অর্থাৎ নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলা যাবে না, যদি তা অর্থবহ না হয় – নির্বাচনের মাধ্যমে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত ব্যক্তিরা নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ না পান।

অনেক দেশেই, এমনকি প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও নির্বাচনে ভোটার অংশগ্রহণের হার অত্যন্ত কম। তাই সেসব দেশে সাধারণত ভোটার সচেতনতার উদ্দেশ্য হয় তাদেরকে নির্বাচনের দিনে ভোটকেন্দ্রে হাজির করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু আমাদের দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ – যেমন, নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮৭ শতাংশের বেশি ভোটার ভোট প্রদান করে। তাই আমাদের দেশে ভোটার সচেতনতা কর্মসূচির লক্ষ্য হওয়া উচিৎ ভোটারদেরকে জেনে-শুনে-বুঝে ভোট প্রদানের জন্য প্রণোদিত করা। প্রণোদিত করা যাতে তারা দুর্নীতিবাজ, কালো টাকার মালিক, পেশীশক্তি ব্যবহারকারী তথা দুর্বৃত্তদেরকে ভোট না দেয়।

গত নির্বাচনের আগে 'সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিকে'র পক্ষ থেকে ভোটারদেরকে বিভিন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীদের ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কিত তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়িত করার দাবিতে সারা দেশে একটি আন্দোলন গড়ে তোলে। পরবর্তীতে বিষয়টি উচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায় এবং আদালত ২০০৫ সালে প্রদত্ত একটি যুগান্তকারী রায়ের মাধ্যমে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের তাদের অপরাধের খতিয়ান, আয়ের উৎস এবং তাদের নিজেদের এবং পরিবারের সম্পদ, দায়-দেনা ইত্যাদির হিসাব হলফনামা আকারে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে জমা দেওয়ার বাধ্যবাধতা সৃষ্টি করে। 'সুজনে'র সঙ্গে জড়িত স্বেচ্চাব্রতীরা নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীদের হলফনামা এবং আয়কর বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি প্রার্থীদের 'তূলনামূলক চিত্র' সারাদেশে ভোটাদের মধ্যে বিতরণ করে। ভোটারদের তথ্য দিয়ে ক্ষমতায়নের এ উদ্যোগের ফলে গত নির্বাচনে কিছু দুর্বৃত্তকে নির্বাচনী ময়দানকে দূরে রাখা সম্ভব হয়েছে। সম্ভব হয়েছে হলফনামায় মিথ্যা তথ্য প্রদানের দায়ে কিছু অবাঞ্চিত ব্যক্তির মনোনয়নপত্র বাতিল করার।

তবে ভোটার সচেতনতা সৃষ্টির এ গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারটিকে সত্যিকারার্থেই কার্যকর করতে হলে এ কাজটি আরও ব্যাপকভাবে করা আবশ্যক। আবশ্যক হলফনামার ছকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা। আরও আবশ্যক তথ্য সংগ্রহ, তথ্য সন্নিবেশিতকরণ ও বিতরণের জন্য অধিক সময় প্রদান। একইসাথে আবশ্যক হলফনামা ও আয়কর বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্য ধারাবাহিকভাবে যাচাই-বাছাই করে অসত্য তথ্য প্রদান ও তথ্য গোপনকারীদের মনোনয়ন এবং নির্বাচনে বিজয়ী হলে নির্বাচন বাতিল। এজন্য অবশ্য প্রয়োজন হবে অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমাদান এবং তথ্য যাচাই-বাচাইয়ের জন্য নির্বাচন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

পরিশেষে, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিলের প্রেক্ষাপটে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ থেকে জাতিকে আশ্বস্ত করা হয় যে, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সত্যিকারার্থে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা হবে। কিন্তু উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, যতক্ষন পর্যন্ত একটি আইনি কাঠামো তৈরি না হয়, প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিরপেক্ষতা নিশ্চিত না হয়, রাজনৈতিক দল ও তাদের মনোনীত প্রার্থীরা সদাচারণ না করে, রাজনীতিবিদরা নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা ও নির্বাচনী আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা প্রদর্শন না করে এবং ভোটাররা সচেতন না হয়, তত দিন পর্যন্ত সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভবপর হবে না। এমনকি সর্বাধিক স্বাধীন ও শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও তা সম্ভবপর নয়। বস্তুত নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের সমন্নিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন সম্ভব। কারণ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে নির্বাচন কমিশন একটি পক্ষমাত্র।

এছাড়াও নির্বাচন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার কথা বলা হলেও এব্যাপারে অদ্যাবধি সরকারের পক্ষ থেকে কোনোরূপ উদ্যেগই লক্ষ্য করা যায় না। নির্বাচন কমিশনের উত্থাপিত সংস্কার প্রস্তাবগুলি সম্পর্কে আওয়ামী লীগ এ পর্যন্ত কোনো মতামতই দেয়নি। অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ প্রদানের ব্যাপারেও তারা এখনও কিছুই বলেনি। তাই দিনবদলের সনদে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার অব্যাহত রাখার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা সত্ত্বেও এ ব্যপারে ইতিবাচক কিছু আশা করা দূরাশা বলেই মনে হয়।

শুধু নির্বাচন পদ্ধতি এবং নির্বাচন কমিশনের সংস্কারই থেমে যায়নি, সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর ফলে আগামী নির্বাচনই যেন আজ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে, যা আমাদের আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই আবারও খাদে ফেলে দিতে পারে। এ অবস্থা থেকে উত্তরনের জন্য আমাদেরকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে অন্তত আরও দুই টার্মের জন্য, পরিবর্তিত রূপে হলেও, ফিরিয়ে আনতে হবে। আর যথাযথ ব্যক্তিদেরকে নির্বাচন কমিশনে নিয়োগ প্রদানের স্বার্থে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ওপরই এ দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমরা মনে করি। কারণ বাছাই কমিটির মাধ্যমে সম্প্রতিক বছরগুলোতে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রায় সবাই দলীয় অনুগত।